Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 232 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 232 – 238
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাঙালি সংস্কৃতিতে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব

ড. ছন্দা ঘোষাল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
ও
বাবলু সরেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
এবং ঝাড়গ্রামের সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক
Email ID: bablusaren24@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bengali, Santal, Austric, Social, Culture, Rituals, Exchange, Influence.

Abstract
Humans are social beings. Without social life, human existence is tough to sustain. And the collective entity of social life is called culture. It means the elegant mentality of any human or any nation to develop the multiple qualities of its culture. Multiplicity here means people's education, religion, art, as well as dance, music, cooking, clothing, literature, faith, festivals, rituals etc. In a word, culture is human's national identity. It is not clear at which moment in history the Indian culture is started; it can be safely said that the tribal culture is very ancient. And the modern buildings of Aryan civilization built on the foundation of tribal culture. So naturally many materials of tribal culture are incorporated in this building. Like Bengali Puja-parbans, festivals-ceremonies, rituals, customs, religion-arts are direct signs of it. A longtime coexistence with each other has resulted in an exchange of ideas as well as an exchange of culture. Thus the field of giving and influence of tribal culture on the Bengali culture is also very old.

Discussion

অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারত মহাদেশে বাঙালি ও আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের সাথে সহাবস্থান করে আসছেন। এই দুই গোষ্ঠীর মানুষের সহাবস্থান ক্ষেত্রটি বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। বাঙালি ও সাঁওতাল এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে তাঁদের মধ্যে যেমন ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে, ভাষার আদান-প্রদান হয়েছে, তেমনি সংস্কৃতির আদান-প্রদানও ব্যাপক ভাবে লক্ষণীয়। দীর্ঘকাল যাবৎ পাশাপাশি অবস্থানে পারস্পরিক এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ ভাবের আদান-প্রদানে একে অপরের ভাষা ও সংস্কৃতিকে যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 232 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমৃদ্ধ করেছেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে এই দুই গোষ্ঠীর বা জাতির পরিচয় সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার।

বাঙালি জাতি বললে কোনো নির্দিষ্ট জাতিকে বোঝায় না। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী মানুষরাই বাঙালি নামে পরিচিত। বিশেষ করে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশে বসবাসকারী অধিবাসীগণ যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যাঁরা বাংলাদেশের এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক তাঁদেরকেই বাঙালি নামে অভিহিত করা হয়। ডঃ অতুল সুরের কথায়, -

> "যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশে বাস করিয়া বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ নাম "বাঙালী" হইয়াছে।"[১]

আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আর্যরা তাঁদের আদি বাসস্থান মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। পন্ডিতদের মতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল উরাল পর্বতের উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার ফলে এঁদের ভাষা তথা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ মূলত দশটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার একটি বিশেষ শাখা হলো ইন্দো-ইরানীয় শাখা। পরে এই শাখাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এর একটি শাখা গিয়েছিল ইরান-পারস্যে আর অন্য শাখাটি প্রবেশ করেছিল ভারত উপমহাদেশে। ভারতবর্ষে প্রবেশিত এই শাখাটিই ভারতীয় আর্য নামে অভিহিত। প্রায় দেড় হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে এই শাখাটির অনুপ্রবেশ ঘটে। ধীরে ধীরে আর্য জাতির বিভিন্ন শাখার মানুষ সমগ্র উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। আর্য জাতির একটা শাখা পশ্চিম উপকূল হয়ে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র হয়ে তামিলনাড়ু প্রদেশে গিয়ে পৌঁছান। তাঁদেরেই আর একদল আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাংলা ও উড়িষ্যায় আসেন এঁরাই মনে হয় বৈদিক সাহিত্যের বর্ণিত অসুর জাতি।

> "বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষ। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি অস্ত্রাল বলা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এদের নিষাদ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর, হো, ভূমিজ, কোড়া, মাহালি প্রভৃতি উপজাতি সমূহ এই জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিল। তাছাড়া, কথাকথিত হিন্দু সমাজের 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর।"[২]

কালক্রমে আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব। প্রখ্যাত ভাষাবিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, - বর্তমান বাঙালি জাতির শতকরা ৯৯ ভাগই আর্য ও অনার্য সংমিশ্রণে সৃষ্ট। তাই বাঙালি জাতিকে সংকর জাতি বলেও অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালে বাঙালিদের আদি বাসভূমি বিহার থেকে আসাম এবং উড়িষ্যা থেকে হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে বাঙালিরা প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই বসবাস করছেন।

বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশের বাঙালি জাতির পরিপূরক জাতি হিসেবে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিকেই গণ্য করা হয়। সাঁওতাল জাতির ইতিহাস ও সাঁওতালদের পুরাণ থেকে জানা যায় যে, বর্তমান ভারতবর্ষে বসবাসকারী সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল 'হিহিড়ি পিপিড়ি' নামক স্থানে। যেটা বর্তমানে ইরাক-ইরান-এ অবস্থিত। আবার অনেকের মতে, এই 'হিহিড়ি পিপিড়ি' স্থানটি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কোনো একটা অঞ্চলে অবস্থিত। বৈদ্যনাথ সরেন এর মতে, -

> "According to the description stated earlier the island Hihiri Pipiri is surrounded by water mass where also one kind of grass had grown (of which two birds 'Hans' and 'Hansil' were made of). The geographical location of this place is New Zealand. The place name "Hihri Pipiri" is very common there."[৩]

কালক্রমে, তাঁরা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

সাঁওতালরা হলেন অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মুন্ডা শাখার এক উল্লেখযোগ্য জাতি। তথাকথিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষরাই হলেন ভারতবর্ষের অন্যতম আদি অধিবাসী। অস্ট্রিক বা প্রোটো-অস্ট্রালায়েড জনগোষ্ঠীই যে ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

> "আর্য-পূর্ব যুগে এই বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রাক-দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা প্রটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Autraloid) গোষ্ঠীর ব্যাপক বসতি ছিল। তারা যে ভাষায় কথা বলত, তা হল অস্ট্রিক ভাষা। জানা যায়, এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 232 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। এই অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীই আজকের বাঙ্গালীরও পূর্ব-পুরুষ।"[৪]

ভারতে এঁরা সুবিশাল একটা সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন যা মূলত অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষের সভ্যতা বলে জানা গেছে। আর্কিওলজিস্টদের মতে, - 'প্রাগৈতিহাসিক যুগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সমসাময়িক ভারতে হরপ্পা সভ্যতাও গড়ে উঠেছে।' ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, - যীশুর জন্মের ছয় হাজার বছর আগে 'মেহের গড়' নামে যে গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে ওঠে তা-ই ক্রমশ বিস্তার লাভ করে হরপ্পা পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে নগর সভ্যতায় পরিণত হয়। যা চিহ্নিত হয় হরপ্পা সভ্যতা নামে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, এই 'মেহের গড়' সভ্যতা নির্মাণে আদি-অস্ট্রালায়েড মানব গোষ্ঠীরও বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ ছিল।

> "প্রাচ্যদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল 'অস্ট্রিক' ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বলা হয়। এদের আদি-অস্ত্রাল বলার কারণ হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিলও আছে। মানুষের রক্ত সাধারণত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় – 'ও', 'এ', 'বি' এবং 'এ-বি'। ভারতের প্রাক-দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। এদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকার ও এদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ খেলানো। তিনেভেলী জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে এরা অনাস, এদের গায়ের রঙ কালো ও এদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের 'নিষাদ'রাই যে আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর কোনও উপজাতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হয় এই মূলজাতির এক শাখা দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মালেনেশিয়ায় যায় এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়।"[৫]

সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হল –

> "প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত অস্তিত্ব এখনও খুঁজে পাওয়া যায় বর্তমানের 'কোলদের মধ্যে। 'কোল' বলতে বোঝায়, সাঁওতাল, মুন্ডা, গন্দ, হো ইত্যাদি উপজাতি। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যায় যে, 'কোল'রাই হচ্ছে ভারতের আদিমতম অধিবাসি বা আদিবাসি।"[৬]

আদিবাসীরা প্রাচীন হলেও তাদের এই 'আদিবাসী' নামটা মোটেই প্রাচীন নয়। যতদূর জানা যায়, ঠক্কর বাপা প্রথম এই নামটা তৈরি করেন; পরে গান্ধীজী নামটা ব্যবহার করতে শুরু করেন। ইংরেজি 'ট্রাইব' কথাটির বাংলা পরিভাষা হিসাবে এটার ব্যবহার হচ্ছে। অনেকে আবার 'উপজাতি' 'খণ্ডজাতি' বা 'জনজাতি' কথাও ব্যবহার করেন।

> "বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'উপজাতি' কথাটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ঝাড়গ্রাম এবং সিউড়িতে 'উপজাতি সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' খুলেছেন। কিন্তু 'উপ' কথাটা হীন বা তুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'উপ' অর্থে মূল শাখার ন্যূন, হীন।"[৭]

সাঁওতালরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম এইসব রাজ্যে সাঁওতালদের বসবাস সবচেয়ে বেশি। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যেও সাঁওতালদের বসবাস লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে মোট কুড়িটি রাজ্যে সাঁওতালদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ ব্যতীত বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মরিশাস, নরওয়ে প্রভৃতি দেশেও সাঁওতালরা বসবাস করেন।

মানুষ হলো সমাজবদ্ধ জীব। সমাজজীবন ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায়। এই সমাজ জীবনের সমষ্টিগত সত্তার বহিঃপ্রকাশই হল সংস্কৃতি। অর্থাই যে কোনো মানুষ বা যে কোনো জাতির বহুবিধ গুনের বিকাশের মার্জিত মানসিকতার মানই হল সংস্কৃতি। বহুবিধ গুন বলতে এখানে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, নৃত্য-সঙ্গীত, খাদ্য উপকরণ, পোষাক আষাক, শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি উপকরণকে বোঝানো হয়েছে। এক কথায় সংস্কৃতি হল – মানব জাতির সামগ্রিক পরিচয়পত্র। যার মধ্যে থাকে মানুষের মার্জিত মানসিকতা ও পূর্ণ সাধনা। যুগ যুগ ধরে মানব জাতির

বিশিষ্ট হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন বা সাধনা, অধ্যাত্ম আকুতি, নৃত্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় যে গৌরবময় প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় তাই হল সংস্কৃতি।

বাংলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটা এসেছে ইংরেজি 'Culture' শব্দ থেকে। অর্থাৎ 'সংস্কৃতি' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে 'Culture' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। এই 'Culture' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Cultura' থেকে। যার মূল ধাতু হল –'Col'। 'Col' কথার অর্থ হল – কৃষ বা কৃষিকাজ। এই 'Culture' 'Cultur' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এডওয়ার্ড টাইলার 1965 খ্রীষ্টাব্দে। তিনি 'Culture' এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসাবে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী – মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্ন হলো সংস্কৃতি। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম কানুন, উৎসব, পালা-পার্বণ, শিল্প কর্ম এবং দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন হাতিয়ার- এই সব কিছুই হল সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ সেসব শিক্ষা, সামর্থ্য ও অভ্যাস আয়ত্ত করে সংস্কৃতির এক একটি অঙ্গ হিসাবে। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার ও ক্লাকহোম এই 'Culture' শব্দের ১৬৩ রকমের প্রচলিত পারিভাষিক ও লৌকিক দু-রকমের অর্থ খুঁজে বার করেন।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহৃত সমস্ত প্রকারের দ্রব্য সামগ্রীকে এক কথায় সংস্কৃতি বলা হয়। এছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য-নাট্য, সঙ্গীত, ধর্মানুষ্ঠান, প্রথা-উৎসব, রীতি-নীতি, অভিনয়, রন্ধন, খেলাধুলা ইত্যাদি সমস্থ কিছুই হল সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় ও চাহিদা পূরণের সমস্ত পার্থিব, অপার্থিব, বস্তুগত ও অবস্তুগত সমস্ত উপকরণই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। হারস্কোভিটস এর কথায়, - Culture is the man made part of the Environment। পবিত্র সরকার তাঁর 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন যে,

> "মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল, - এই দুয়ের তফাৎই হল সংস্কৃতির তফাৎ। পৃথিবীর জীবন প্রতিবেশি মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই 'সংস্কৃতি' বাকিটা হল প্রকৃতি।"[৮]

আলোচনার মূখ্য বিষয় - বাঙালির সংস্কৃতিতে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলার সংস্কৃতি হিসাবে বাঙালির সংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতি হিসাবে সাঁওতাল সংস্কৃতিকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, এই দুই জনগোষ্ঠীর মানুষের স্বতন্ত্র সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে। স্বতন্ত্র জাতি, দুই গোষ্ঠীর ভাষা আলাদা, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি আলাদা, ধর্ম আলাদা, দেবস্থান আলাদা সর্বোপরি এঁদের লিপিও আলাদা। অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গ জাতির যা যা বৈশিষ্ট্য বা Criteria থাকা দরকার এই দুই জনগোষ্ঠীর তা সব কিছুই বর্তমান। তবুও দীর্ঘদিন একে অপরের সান্নিধ্যে সহাবস্থান করার ফলে যেমন ভাবের আদান প্রদান হয়েছে তেমনি সংস্কৃতিরও ব্যাপক আদান প্রদান হয়েছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি অতিসমৃদ্ধি ও প্রভাবিত হয়েছে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে বাঙালির সংস্কৃতিতে আদিবাসী সংস্কৃতি বা সাঁওতাল সংস্কৃতির আদান প্রদান ও প্রভাবের ক্ষেত্রটি উপস্থাপন করা হল।

বাঙালির সংস্কৃতিতে আদিবাসী বা সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালির সংস্কৃতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত এবং সম্মৃদ্ধ করেছে। যেমন পাথরের আরাধনা, ভগবানের আরাধনার সময় মানুষের সুরা উৎসর্গ করে দেবতার উপাসনা করা ইত্যাদি। সর্বপ্রাণবাদী অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর চেতনায় কোনো মূর্তির প্রয়োজন হয়নি বা মূর্তি সংরক্ষণ করার জন্য কোনো মন্দির বা মসজিদের প্রয়োজন হয়নি। তাঁদের ধারণায় অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন সেই শক্তিকে কোনো কিছুর মাধ্যমে আরাধনা করা। আরাধনা করার জন্য প্রধান দুটি প্রতীক হল – প্রস্তর খণ্ড ও জল। সাগুন ঠিলি বা মঙ্গল ঘটে রাখা জল আর শাল গাছের তলায় রাখা প্রস্তর খণ্ডকেই শক্তির প্রতীক বা দেব-দেবীর প্রতীক রূপে আরাধনা করা হয়। এই সাগুন ঠিলি দাঃ থেকেই সম্ভবত হিন্দুদের 'মঙ্গল ঘট' -এর প্রচলন।

আর্যরা প্রথম যখন এই দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। তাই নিজেদের বংশ বৃদ্ধির কারণে বা জৈবিক ক্রিয়ার তাগিদে এই দেশের অনার্য নারীদের বিবাহ করতে শুরু করেন। ফলে অনার্য নারীদের মাধ্যমে অনার্য সংস্কৃতিও আর্য সমাজের ভিত্তিমূলে প্রবেশ করে। আর্যরা ছিলেন যাযাবর। তাঁরা গৃহ নির্মান করতে জানতেন না, কৃষিকাজ জানতেন না। পশুপালনই ছিল তাঁদের উপজীবিকা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 232 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আদিবাসীদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার কারণেই হল, আদিবাসী রক্তের সঙ্গে বাঙালি রক্তের নৈকট্য। শুধু তা-ই নয়, বাঙালির চিরাচরিত ধারণা, সংস্কার ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্কও আমরা খুঁজে পেতে পারি।"[৯]

আর্যদের এই সভ্যতা সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,

> "বস্তুত আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘর অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি। অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।"[১০]

বাংলার আদিম আধিবাসী হলেন অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বলা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'নিষাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, লোধা প্রভৃতি উপজাতিকে বোঝায়। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে 'অসুর' জাতি বলে বর্ণিত করা হয়েছে। অসুরদের সমাজব্যবস্থা ছিল কৌমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

> "একেবারে গোড়ায় বাঙলার সমাজব্যবস্থা কৌমভিত্তিক ছিল। ঋগ্বেদ পড়লে বুঝতে পারা যায় যে আর্য সমাজেও সেই ব্যবস্থা ছিল। এই কৌমভিত্তিক শাসনপদ্ধতি থেকেই রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে এটার উদ্ভব প্রাচ্যদেশের অসুরগণ কর্তৃকই সাধিত হয়েছিল; আর্যগণ কর্তৃত নয়।"[১১]

বাঙালির পূজা-পার্বণ, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানেও অনার্য বা আদিবাসীদের ছোঁয়া লেগে আছে। ডঃ অতুল সুরের কথায়, -

> "বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন – দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের থেকে গৃহিত হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও গৃহিত হয়েছিল আটকৌড়ে সুবচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদির আচার যা বর্তমান কালেও বাঙ্গালী হিন্দু পালন করে থাকে। এই সবই তো প্রাক-আর্য সংস্কৃতির অবদান।"[১২]

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কলা ও কলা গাছের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। হিন্দু বাঙালির এমন কোন অনুষ্ঠান নেই যেখানে কলাগাছ কিংবা কলার ব্যবহার নেই। কলার নৈবেদ্য ছাড়া দেবদেবীর পূজা হয় না। কলার খোলের ডোঙ্গায় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি অর্পণ করা হয়। কাঁঠালি কলা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা হয় না। বিয়ের সময় ছাদনাতলা ঘেরার জন্য কলাগাছ লাগে। আবার কলা গাছ দিয়ে তৈরি হয় কলাবউ, শুধু তাই নয় গণেশমাতা রূপেও কলাবতীর পুজো হয়। গৃহপ্রবেশ, অতিথিবরণ এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে কলা গাছ না হলে তো চলে না। অথচ কলা দেখা মানেই যাত্রা অশুভ। কাঁচকলা দেখানো মানে অসম্মান করা। কিন্তু আদিবাসী সমাজে এই কলাগাছ উর্বরতা ও ফলনশীলতার প্রতীক। কলাগাছ একবার ফল দিয়েই মরে যায়। সেই জন্য বন্ধ্যা পুরুষ কিংবা বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই কলাগাছ লাগায়। আদিবাসী সমাজে কোন অবিবাহিত যুবক কোন স্বামী-পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা নারীকে সরাসরি বিবাহ করতে পারে না। প্রথমে আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি কলা গাছকে বিবাহ করতে হয়। তারপর যুবকটি স্বামী-পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা নারীকে 'সাঁঘা বাপলা' করে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এতে কোন অশুভ শক্তি যুবকের ওপর পড়ে না। আদিবাসী সমাজে কলাগাছকে জীবন্ত আত্মার অধিকারীরূপে বিশ্বাস করা হয়। কারণ কলাগাছে কখনো বজ্রপাত হয় না। কলাগাছ অশুভ শক্তির প্রতিষেধক রূপে কাজ করে। কলাগাছ' ব্যবহারের এই ধারণাও আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেছে।

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তরজীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষদের পুজা, কৃষি সম্পর্কিত অনেক উৎসব যেমন পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি, মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাল, দূর্বা, কলা, হরিদ্রা, পান, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার, শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গ পূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি আজো অন্তর জাতিসমূহের ধর্মীয় আচার এর অন্তর্গত।

> "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাংলাদেশে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রাকৃতিক শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, 'টোটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত, ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভুত-প্রেত দ্বারা সংগঠিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন, অনুশাসন ইত্যাদি নিয়ে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের পরিবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা- পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল।"[১৩]

> "বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষ-পার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুবচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্র হরিদ্রা, পান খিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমান কালেও বাঙালি হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক- আর্য সংস্কৃতির অবদান। এছাড়া নানা রূপ গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা, ধ্বজা পূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, যাত্রা জাতীয় পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাগুলী, পর্ণশবরী, প্রকৃতি পূজা ও অম্বুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক-আর্য জাতিসমূহের কাছ থেকে নেওয়া।"[১৪]

ইতিহাসের ঠিক কোন শুভক্ষণে সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও ভারতীয় আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি যে বহু প্রাচীন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই আদিবাসী সংস্কৃতির ভিত্তিমূলের উপর গড়ে উঠেছে আর্য সভ্যতার আধুনিক ইমারত। তাই স্বভাবতই আদিবাসী সংস্কৃতির বহু উপকরণই এই ইমারতের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। বাংলার তথা বাঙালির পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম-শিল্পকলা তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। দীর্ঘকাল একে অপরের সাথে সহাবস্থান করার ফলে তাঁদের মধ্যে যেমন ভাবের আদান প্রদান হয়েছে তেমনি সংস্কৃতির আদান প্রদান এবং প্রভাবের ক্ষেত্রটিও অতি সুপ্রাচীন ও সুসম্পর্ক বদ্ধ।

Reference:

১. সান্যাল, দুর্গাচরণ. বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা : মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯০৮, পৃ. ২

২. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (চতুর্থ সংস্করণ). কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১২, পৃ. ২১

৩. Saren, Baidyanath. The Kherwal (1^{st} Edition). কলকাতা : ASECA(W.B.), ২০০৮, পৃ. ১৩

৪. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (সপ্তম সংস্করণ). কলকাতা : দ্য বাসন্তী প্রেস, ২০১৪, পৃ. ৩

৫. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (চতুর্থ সংস্করণ). কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১২, পৃ. ৪১-৪২

৬. হেমব্রম, পরিমল. সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা : নির্মল বুক এজেন্সী, ২০১০, পৃ. ৩৪

৭. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি সমাজ-প্রথম খণ্ড (সপ্তম সংস্করণ). কলকাতা : বাস্কে পাবলিকেশন, ২০১৮, পৃ. ২

৮. সরকার, পবিত্র. লোকভাষা লোকসংস্কৃতি. কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ১৫
৯. ভৌমিক, সুহৃদকুমার. বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা : মনফকিরা, ২০১৩, পৃ. ১৪
১০. রায়, ডঃ নীহাররঞ্জন. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (অষ্টম সংস্করণ). কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, বঙ্গাব্দ– ১৪২০, পৃ. ৭৩
১১. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (চতুর্থ সংস্করণ). পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
১২. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলার সামাজিক ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮২, পৃ. ৪৯
১৩. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলা ও বাঙালী (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা : সাহিত্যলোক, বঙ্গাব্দ-১৩৫৭, পৃ. ২৪
১৪. সুর, ডঃ অতুল. বাঙলা ও বাঙালী (প্রথম সংস্করণ). পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫